অদ্বৈতবেদান্তসম্মত মায়াতত্ত্ব : বৈদিকবাঙ্ময়ানুসারী একটি তাত্ত্বিক অন্বেষণ

সৌভিক বিশ্বাস

Abstract

The Advaita Vedanta school of thought is part of Vedanta philosophy, one of the six chief theist Indian philosophical schools. The theory of 'Māyā' holds a special significance in Advaita Vedanta philosophy. Since Māyā is a technical term in Vedanta philosophy, it is easily assumed that the term is aligned to a theoretical structure. This study seeks to explore both '*Tattvamāyā*' (the theory based on Maya) and '*Shabdamāyā*' (the meaning of the word). The Advaita philosophers, Gaudapādāchārya and Shankarāchārya, fully developed *Tattvamāyā* (the theory of Māyā) in their thought, and presented 'Māyāvāda' as a theory in Advaita Vedanta philosophy.

However, they were not the first to use the term 'Māyā'. The word 'Māyā' has been mentioned several times in Vedic literature, such as in the *Samhitā* or *Mantrabhāga*, Brahmanical literature, and Upanishad-literature. The question therefore arises, whether the development of this theory (Māyātattva) resulted from the original thinking of both Gaudapādāchārya and Shankarāchārya, or whether the theory is a well-organised reiteration of the term as found scattered throughout the Vedic literature preceding Advaita Vedanta. This essay, therefore, also attempts to examine whether the meaning of 'Māyātattva' as found in Advaita Vedanta, is revealed in the Vedic literature that precedes it.

Keywords: *Vedic literature, Indian Philosophy, Advaita Vedanta, Māyā, Shankarāchārya.*

মায়াশব্দের ব্যুৎপত্তি

অদ্বৈতবেদান্ত সম্মত মায়াবাদ সম্পর্কিত যে কোন আলোচনার পূর্বে মায়া এই শব্দটির অভিধার্থ অনুসন্ধানে ব্যুৎপত্তি নির্ণেয়। ব্যুৎপত্তি হল শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাজন। মায়া শব্দটির প্রকৃতি মা–ধাতু বা ক্রিয়া। *পানিণীয়ধাতুপাঠ* গ্রন্থে (পাণিনিপ্রণীত ধাতু বা ক্রিয়ার তালিকাগ্রন্থ) তিনটি গণে মায়াশব্দের প্রকৃতি মা–ধাতু উল্লিখিত। অদাদিগণীয় পরিমাপার্থক মাঙ্ মানে[1], জুহোত্যাদিগণে মাঙ্ মানে শব্দে চ[2] এবং দিবাদিগণীয় মাঙ্ মানে[3] এইভাবে মা–ধাতুর উল্লেখ আছে। গণভেদের কারণে মা–ধাতুর রূপভিন্নতা

থাকলেও অর্থভিন্নতা প্রায় নেই। পরিমাপার্থেই 'মা'–ধাতুর অর্থ গৃহীত। তাই প্রত্যেকটি গণেই 'মা'–ধাতুর অর্থে 'মান' শব্দটি উক্ত। মানার্থক 'মা'–ধাতুর উত্তর 'শ্যাদ্ব্যধাশ্রুসংস্বতীণবসাবহ্বলিহশ্লিষশ্বসশ্চ'[4] (*অষ্টাধ্যায়ী* সূত্রক্রম – ৩.১.১৪১), বৈয়াকরণ পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*–র (সংস্কৃত ব্যাকরণগ্রন্থ) সূত্রানুসারে কর্ত্তৃবাচ্যে 'ণ'–প্রত্যয় হয়। মাঙ্ মা–ণ এই অবস্থায় 'আতো যুক্ চিণ–কৃতোঃ[5] (*অষ্টাধ্যায়ী* সূত্রক্রম ৭.৩.৩৩), এই পাণিনিসূত্রানুসারে চিণ্–প্রত্যয়, ঞকার, ণকার অনুবন্ধ, কৃত্–প্রত্যয় পরে থাকলে আকারান্ত ধাতুর পর যকার আগম হয়। মা–ণ মা–য এই অবস্থায় 'অজাদ্যতষ্টাপ্'[6] (*অষ্টাধ্যায়ী* সূত্রক্রম – ৪.১.৪), সূত্রে অকারান্ত প্রকৃতি মা–ধাতুর উত্তর স্ত্রীত্ব বিবক্ষায় টাপ্ প্রত্যয়যোগে অনুবন্ধলোপে মায়াশব্দ ব্যুৎপন্ন হয়। কর্ত্তৃবাচ্যে প্রত্যয় বিহিত হওয়ায় মায়া শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অভিধার্থ হল, যে পরিমাপ করে এবং লক্ষ্যার্থ হয় যে স্বয়ং জ্ঞানদায়ক।

মায়াশব্দের নির্বচন

সংস্কৃতভাষায় ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে প্রকৃতিপ্রত্যয় বিভাগ করে যেরূপ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়, অনুরূপ বর্ণাগম, বর্ণবিকার, বর্ণের স্থান পরিবর্তন, শব্দের দ্বিরুক্তি ইত্যাদির সাহায্যে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করার পদ্ধতিকে বলে নির্বচন। শব্দের মধ্যে থাকা শব্দাংশ জুড়ে জুড়ে সমগ্র শব্দের অর্থ নির্ণয়ের এই রীতি নির্বচন বা নিরুক্তি নামে প্রসিদ্ধ। বেদের বিভিন্ন অংশে অন্তত ৮৩৩টি শব্দের অবয়ব বিশ্লেষণ করে অর্থনির্দেশ করতে দেখা যায়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে যাস্কাচার্য নিঘন্টু গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ নিরুক্ত রচনা করেন। নিরুক্তে প্রায় ১২৯৮টি বৈদিকশব্দের নির্বচন বা নিরুক্তি করা হয়েছে। নিরুক্তে শব্দনির্বচনের লক্ষ্য অর্থনির্ধারণ।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য *ঋগ্বেদ*–এর তৃতীয়মণ্ডলের সাতাশতম সূক্তের সপ্তমমন্ত্রের ভাষ্যে মায়াশব্দের নির্বচনপ্রসঙ্গে বলেছেন–

> মাঙ্ মানে শব্দে চ' ইত্যস্মাত্ 'মাচ্ছাসসিসূভ্যো যঃ' ইতি কর্তরি কর্মণি বা যপ্রত্যয়ঃ। মিমীতে জানীতে কর্ম মীয়তে অনয়েতি বা মায়া কর্মবিষয়জ্ঞানং।[7]

অর্থাৎ জুহোত্যাদিগণীয় মাঙ্ ধাতুকে সায়ণাচার্য জ্ঞান বা প্রজ্ঞান অর্থে গ্রহণ করেছেন। এছাড়া অন্যভাবেও মায়াশব্দের নির্বাচন প্রসঙ্গে বলা যায় – 'মীয়তে অনয়েতি মায়া।'[8] অর্থাৎ যার দ্বারা পরিমাপ করা হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে কি পরিমাপ করা হয়, উত্তরে বলা হয় জগৎ। আসলে এমন এক বিভ্রান্তিকর প্রক্ষেপণ, যার দ্বারা অপরিমেয় ব্রহ্মকে পরিমেয় বলে মনে করা হয় তাই মায়া। অপর একটি নির্বচন হল 'মাতি স্বাত্মানং দর্শয়তি ইতি মায়া'[9] অর্থাৎ যে নিজেকে দর্শন করায় নিজের কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছাড়া।

অতএব নিজের লৌকিক অস্তিত্ব ছাড়া যে নিজেকে দর্শন করায় তাকেই মায়া বলে । চতুর্থতঃ, অন্য একটি কল্পিত অর্থে – মায়া = মা (নেতিবাচক অব্যয়), যা (বস্তুবাচক শব্দ), যা নয়, অর্থাৎ যা সত্যিকার অর্থে নেই, তবে এখনও উপস্থিত বলে মনে হয় তাই মায়া। অতএব জুহোত্যাদিগণীয়, অদাদিগণীয় ও দিবাদিগণীয় এই তিন প্রকার 'মা'–ধাতুর যেকোন প্রকার থেকে নির্বচনের মাধ্যমে অভীষ্টার্থ লব্ধব্য ।

_নিরুক্তগ্রন্থে মায়াশব্দের প্রয়োগ_

বৈদিক শব্দাভিধান যাস্কাচার্য প্রণীত _নিরুক্ত_ বেদমন্ত্রসমূহে দুরূহ শব্দসমূহের নির্বচন ও প্রয়োগার্থ ব্যাখ্যাত হয়েছে এই গ্রন্থে। _নিরুক্তে_ পাঁচটি স্থানে মায়াশব্দের উল্লেখ আছে। প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের নবম পরিচ্ছেদের প্রথমমন্ত্রে মায়াশব্দ উক্ত হয়েছে –

> উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।
> অধেন্বা চরতি মায়য়া এষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাম্।।[10]

এখানে জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা করা হয়েছে। এখানে 'মায়য়া' শব্দের অর্থ নিষ্ফল, অর্থা উদকভ্রমে মরীচিকার প্রতি ধাবমান হওয়া, কিন্তু মরীচিকা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করতে পারে না। অজ্ঞ ব্যাক্তি ফল অদাত্রী মায়ার দ্বারা সমাবৃত হওয়ায় বেদবাক্য প্রতিপাদ্য দেবতাজ্ঞান, যজ্ঞজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান তার কাছে প্রতিভাত হয় না। সুতরাং এখানে মায়া শব্দের অর্থ আচ্ছাদনশক্তি।

> প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের নবমপরিচ্ছেদে প্রথমমন্ত্র –
> অপাধেন্বা হ্যেষা চরতি মায়য়া বাকপ্রতিরূপয়া নাস্মৈ কামান্ দুগ্ধে।
> বাগ্ দোহ্যান্ দেবমনুষ্যস্থানেষু, যো বাচং শ্রুতবান্ ভবত্যফলামপুষ্পামিত্যফলাস্মা
> অপুষ্পা বাগ্ ভবতীতি বা কিঞ্চিৎপুষ্পফলেতি বা।।[11]

এখানেও অজ্ঞব্যক্তি অর্থহীন মনে করে বেদবাক্য শ্রবণ করে, বেদবাক্য তার কাছে মায়ামাত্র। অর্থাৎ বেদবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে না। এখানেও আবরণপ্রসঙ্গ বিদ্যমান।

> ষষ্ঠাধ্যায়ের ত্রয়োদশপরিচ্ছেদের ষষ্ঠসংখ্যকমন্ত্র –
> বরুণ ইত্যপরং, তংপ্রজ্ঞয়া স্তৌতি ইমামূনু কবিতমস্য মায়াম্ (ঋগ্বেদ – ৫৮৫৬)
> ইত্যপি নিগমো ভবতি।[12]

এমন্ত্রে বরুণদেবতার স্তব করেছেন ঋষি অত্রি। এখানে মায়া শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা, বরুণের প্রজ্ঞা সুমহতী।

নিরুক্তের সপ্তমাধ্যায়ের সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদের ষষ্ঠমন্ত্রে পুনরায় মায়াশব্দের

উল্লেখ বিদ্যমান–

মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিতঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।
মায়া মূ তু যজ্ঞিয়ানামেতামপো যত্তূর্ণিশ্চরতি প্রজানন্।[13]

এটি অগ্নির ত্রিস্থানভাগবিষয়ক মন্ত্র। এখানে অগ্নিকে যজ্ঞসম্পাদক দেবগণের প্রজ্ঞাননিমিত্ত বলা হয়েছে। অর্থা মায়া এখানেপ্রজ্ঞানবাচক শব্দ।

দ্বাদশাধ্যায়ায়ের সপ্তদশপরিচ্ছেদের প্রথমমন্ত্র –
শুক্রং হি অন্যদ্ যজতং তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবীসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো ভদ্রা তে পূষণিহ রাতিরস্তু ।।[14]

এখানে আচার্য যাস্ক মায়া শব্দের অর্থ করেছেনপ্রজ্ঞান । *নিরুক্ত* গ্রন্থের টীকাকার আচার্য স্কন্দস্বামীও তাঁকে সমর্থন করেছেন– 'প্রজ্ঞানহেতুপ্রকাশদানেন ত্বং পালয়সি।'[15] পূষাদেবতার দুটি রূপ– লোহিতমণ্ডলবর্ণ ও যজ্ঞার্হ মণ্ডলাধিষ্ঠায়কদেবতা। পূষা সর্ববিধ প্রজ্ঞানের পালয়িতা। অর্থা পূষা সর্বপ্রকারপ্রজ্ঞানের রক্ষক।

সুতরাং নিরুক্তে উক্ত মায়াশব্দের অর্থবিশ্লেষণপ্রসঙ্গে বলা যায়, এখানে মায়া শব্দটি মূলতঃ দুটি অর্থেপ্রযুক্ত আবরণ ও প্রজ্ঞান।

ঋগ্বেদে মায়াশব্দের প্রয়োগ

ঋগ্বেদসংহিতায় মায়াশব্দের ব্যবহারবৈচিত্র লক্ষণীয়। এখানে সর্বমোট পঁচাত্তরটি সূক্তে মায়া শব্দের উল্লেখ রয়েছে, কখনও সমাসবদ্ধ অবস্থায়, কখনও বা এককভাবে। ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিতে ভিন্ন ভিন্নার্থে মায়াশব্দ ব্যবহৃত। সামগ্রিকভাবে চুরানব্বইবার মায়াশব্দ ও মায়াবাচক শব্দের উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। এর মধ্যে পঁয়ত্রিশবার ইন্দ্রদেবতাকে উদ্দেশ্যে করে, চারবার অগ্নিদেবতাকে, চারবার যুগ্মদেবতা অশ্বিনীদ্বয়ের ও মারুতদেবতার উদ্দেশ্যে, তিনবার বিশ্বদেবের জন্য, দুইবার বরুণদেবতা, সোমদেবতা ও দ্যাবাপৃথ্বীদেবতা, মিত্রবরুণদেবতার জন্য, একবার উষাদেবতা, সরস্বতীদেবতা, আদিত্যদেবতা, পুষাদেবতা, অত্রিদেবতা, জ্ঞানদেবতা, রিভুদেবতা, ইন্দ্রবরুণদেবতা, সোমার্কদেবতা, ইন্দ্রবিষ্ণুদেবতা, প্রজাপতি–বৈশ্বামিত্রদেবতা, এবং সূর্য–বৈশ্বানরদেবতার জন্য। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলা যায় যে, মায়াশব্দটি কোন বিশেষ দেবতার বা বিশেষ অর্থে জন্য ঋগ্বৈদিক সংহিতায় ব্যবহৃত হয়নি।

ঋগ্বেদীয় সায়ণভাষ্যে মায়াশব্দের অর্থবৈচিত্র্য

মায়াশব্দ প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে চব্বিশবার ঋগ্বেদসংহিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই চব্বিশবারের মধ্যে আসুরীশক্তি বা অশুভশক্তি অর্থে উনিশবার। এছাড়া কপটতা,প্রজ্ঞা,

অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্য অর্থে মায়াশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'মায়য়া'– এইভাবে তৃতীয়ার একবচনে উনিশবার উক্ত হয়েছে, তার মধ্যে সবথেকে বেশী তেরবার প্রজ্ঞা অর্থে উক্ত হয়েছে। তাছাড়া বঞ্চনা, শক্তি, ভ্রান্তি, কর্মবিষয়জ্ঞানর্থেও এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 'মায়িন্'–শব্দ দ্বিতীয়ার বহুবচনে পনেরবার প্রযুক্ত, তার মধ্যে আসুরী শক্তি অর্থে সবথেকে বেশীবার প্রযুক্ত হয়েছে। এছাড়া প্রজ্ঞা ও দেবশক্তির অর্থেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। 'মায়াভিঃ' – এইভাবে তৃতীয়ার বহুবচনে সবথেকে বেশীবার প্রজ্ঞার্থে, এছাড়া কাপট্য, শক্তি, ও কর্মার্থেও এর ব্যবহার হয়েছে। প্রথমার একবচনে প্রভার্থে, মিথ্যার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 'মায়িন্'–শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে আসুরীশক্ত্যর্থে, 'মায়িনি'–পদটি আসুরীশক্ত্যর্থে, 'মায়িনী'–পদটি প্রজ্ঞার্থে, মায়িনা প্রজ্ঞার্থে, মায়াবিনা প্রজ্ঞার্থে, 'মায়াবান্' ও 'মায়াবিনাম্' কপটতার্থে, 'মায়াবিনঃ' প্রজ্ঞার্থে, 'মায়ী' প্রজ্ঞার্থে উল্লিখিত। এই সমস্ত তথ্য থেকে একথা বলা যায় যে, মায়াশব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়, প্রসঙ্গানুসারে বারংবার তা পরিবর্তিত হয়েছে। শব্দটির অর্থশৈথিল্য এর প্রয়োগবৈচিত্রের একমাত্র কারণ বলে মনে হয়। এছাড়া এই সিদ্ধান্ত করা অত্যুক্তি হবে না যে, এই অর্থশৈথিল্যের কারণেই হয়ত মায়াশব্দটি থেকে তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে।

মায়াশব্দার্থবিষয়ে যাস্কাচার্য ও সায়ণাচার্যের অভিমতের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

আচার্য যাস্ক এবং আচার্য সায়ণ উভয়ই মায়া শব্দকে প্রজ্ঞা অর্থ গ্রহণ করেছেন । আচার্য যাস্ক *নিরুক্তে* পাঁচবার মায়া শব্দের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে চারবার তিনি প্রজ্ঞার্থে মায়া শব্দকে গ্রহণ করেছেন। একবার আবরণার্থে গ্রহণ করেছেন।

ঋগ্বেদে ছেচল্লিশবার সাক্ষাৎ মায়াশব্দের উল্লেখ আছে। এছাড়া আটচল্লিশবার মায়াবাচক শব্দের উল্লেখ আছে। আচার্য সায়ণ তাঁর ঋগ্বেদভাষ্যে এরমধ্যে সবথেকে বেশীবার তিনি আসুরীশক্তি অর্থে গ্রহণ করেছেন, প্রায় তেতাল্লিশবার। এরপর দ্বিতীয় সবথেকে বেশীবার তিনি প্রজ্ঞার্থে গ্রহণ করেছেন, প্রায় সাতাশবার। এছাড়া আচার্য সায়ণ তাঁর সম্পূর্ণ ঋগ্বেদভাষ্যে অন্যান্য নয়টি অর্থে প্রায় চব্বিশবার মায়া শব্দের ব্যবহার করেছেন।

সায়ণাচার্য ও যাস্কাচার্য মায়াশব্দের অর্থবিবেচনায় সম্পূর্ণ ঐক্যমতে উপনীত হননি। উভয়ের সিদ্ধান্তে আংশিক মিল ও আংশিক অমিল রয়েছে। উভয়েই মায়াশব্দকে প্রজ্ঞার্থে উল্লেখ করেছেন। আচার্য সায়ণ সবথেকে বেশীবার মায়াশব্দকে উল্লেখ করেছেন আসুরীশক্তি অর্থে, আচার্য যাস্ক একবারও সেই অর্থ উল্লেখ করেননি। আচার্য যাস্ক আবরণার্থে মায়াশব্দকে উল্লেখ করেছেন। যা আচার্য সায়ণ করেননি। তিনি কপটতা অর্থ উল্লেখ করেছেন, যা আবরণার্থের কাছাকাছি। আচার্য যাস্কের সময়কাল আনুমানিক

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক, আচার্য সায়ণের সময়কাল খ্রীষ্টাব্দ চতুর্দশ শতক। দুজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় একুশশবছর। তাই শব্দার্থের ব্যবধান স্বাভাবিক।

যজুর্বেদে মায়াশব্দের প্রয়োগ

শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী–সংহিতায় (মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব শাখা) মায়া শব্দ বিভিন্ন বিভক্তিতে চারবার উক্ত হয়েছে। এই প্রয়োগ থেকে নতুন কোন তথ্যপ্রাপ্তি হয় না। আচার্য মহীধর তাঁর ভাষ্যে মায়া শব্দেরপ্রজ্ঞা বা বুদ্ধি অর্থ গ্রহণ করেছেন।

অথর্ববেদে মায়াশব্দের প্রয়োগ

সমগ্র অথর্ববেদে ষোলটি সূক্তে মায়াবাচক শব্দটি ত্রিশবার উক্ত হয়েছে। তার মধ্যে কোন কোনও সূক্তে একাধিকবার উক্ত হয়েছে। এর মধ্যে তেইশবার মায়া শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিতে উক্ত হয়েছে। বাকি সাতবার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়যুক্ত অবস্থায় উক্ত হয়েছে। এখানে মায়াশব্দ আসুরীশক্তি অর্থে চারবার, দেবতার শক্তি বিষয়ে পাঁচবার, কখনো ইন্দ্রের অসুরবিনাশকশক্তি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শক্তি, বরুণদেবতার শক্তিরূপেও উল্লেখিত। এছাড়া নানারূপগ্রহণসামর্থ্য ও উচ্চশব্দার্থেও মায়াশব্দের ব্যবহার অথর্ববেদে পাওয়া যায়। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হল অথর্ববেদের উনবিংশকাণ্ডে মায়াশব্দের অজ্ঞানার্থে প্রয়োগ পাওয়া যায় । যা পরবর্তীকালে শাঙ্করদর্শনে পল্লবিত হয়েছে। বাকি তিনটি বেদে কখনও অজ্ঞানার্থে মায়াশব্দের প্রয়োগ হয়নি। সুতরাং কালানুক্রমিক বিচারের দিক থেকে পরবর্তীকালীন বৈদিকসাহিত্যে অজ্ঞানার্থে মায়াশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ সংহিতাসাহিত্যে মাত্র একবার মায়াশব্দের অজ্ঞানার্থে ব্যবহার হয়েছে। বাকি অন্যান্য ক্ষেত্রে মায়াশব্দের নানার্থে ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায় যে, মায়াশব্দের অর্থ অত্যন্ত শিথিল ছিল, প্রসঙ্গানুসারে তা পরিবর্তিত হয়েছে। এতটাই শিথিল যে, প্রভারূপ অর্থ থেকে শুরু করে উচ্চশব্দার্থেও প্রয়োগ হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগতভাবে কোনভাবেই এই অর্থগুলির কাছাকাছি পৌছান যায় না। তাই অনুমান করা যায়, শব্দটির অর্থ শিথিল ছিল বলেই এটি তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

অথর্ববেদের বিষযবস্তুর প্রকৃতি অনুসারে মায়া শব্দের ব্যবহার হয়েছে বলে এর অর্থ বিচার করা খুব সহজ। এখানে ঋগ্বেদে কথিত শক্তির রহস্যময় বা ইন্দ্রজালিক উপাদানটির উপর অথর্ববেদে বেশি জোর দেওয়া হযেছে এবং এই অর্থকে উপেক্ষা করার খুব কমই সুযোগ আছে বলে মনে হয়। মায়া শব্দের অর্থ যে ইন্দ্রজাল, তা সমগ্র অথর্ববেদ জুড়ে, এবং অথর্ববেদের অনুবাদক অধ্যাপক William Dwight Whitney মায়া শব্দের বিভ্রম অর্থে অনুবাদ করেন।

এখনও পর্যন্ত আমরা দেখতে পেযেছি যে, মায়ার অর্থ ঋগ্বেদে একটি অলৌকিক বা

অতিপ্রাকৃত শক্তি, একটি অতিরিক্ত অসাধারণ দক্ষতা, এবং এর অলৌকিক উপাদানটিকে অথর্ববেদে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে এর অর্থ যাদু, তাই একে বিভ্রমও বলা হয়।

ব্রাহ্মণসাহিত্যে মায়াশব্দের প্রয়োগ

বৈদিকব্রাহ্মণসাহিত্যে মায়া শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার আলোচনা আমাদের এখানে অতিরিক্ত বা অভিনব কোন তথ্যের সন্ধান দেবে না। আচার্য পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যগ্রন্থের চতুর্থপাদের তৃতীয়াহ্নিকের কারকে (*অষ্টাধ্যায়ী* সূত্রক্রম: ১৪২৩) সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন 'পর্যাপ্তো হ্যেক পুলাকঃ স্থাল্যা নিদর্শনায়'[16] । এর অর্থ হলো যদি একটি হাড়িতে এক ধরনের চাল সেদ্ধ করতে বসানো হয় তাহলে একটি চাল পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় পুরো হাঁড়ির চালগুলির কি অবস্থা। সুতরাং ব্রাহ্মণসাহিত্যে উক্ত মায়াশব্দের অর্থ সংহিতাভাগের অর্থব্যতিরিক্ত নতুন কিছু নয়।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়ব্রাহ্মণে মায়া শব্দ বেশ কয়েকবার উক্ত হয়েছে, যেখানে মায়া শব্দের অর্থ করা হয়েছে অতিপ্রাকৃত ঐন্দ্রজালিকশক্তি । কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে মায়া শব্দ উক্ত হয়েছে একবার, তার ভাষ্যে আচার্য সায়ণ মায়া শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন মায়া হল দৈবশক্তি । কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে মায়া শব্দ তিনবার উক্ত হয়েছে, যেখানে মায়া শব্দের অর্থ করা হয়েছে অলৌকিকশক্তি। এই শতপথব্রাহ্মণের ভাষ্যে আচার্য সায়ণ মায়াশব্দের অর্থপ্রসঙ্গে দুটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন : অঘটিতঘটনাশক্তিঃ ও পরমব্যামোহকারিণীশক্তিঃ। সাদৃশ্য আছে মায়ার চলতি লক্ষণের সাথে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া। পঞ্চবিংশতিব্রাহ্মণ গ্রন্থে মায়া শব্দের একই অর্থে অর্থাৎ অলৌকিকশক্তি অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

উপনিষদে মায়াশব্দের প্রয়োগ

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

যা ব্রাহ্মণসাহিত্যের চূড়ান্ত অংশ, আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য মৌলিক গুরুত্ব সহকারে সেই উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি অবলম্বনে উক্ত মায়াশব্দের আলোচনা প্রয়োজন। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ প্রাচীনতম এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মায়া শব্দটি একবার উক্ত হয়েছে।

শুক্লযজুর্বেদীয় কাণ্বশাখীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের মধুকাণ্ডে অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে মধুতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশপ্রসঙ্গে একটি ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের উল্লেখ করেন। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদের ষষ্ঠমণ্ডলে ইন্দ্রদেবতার স্তুতিতে

ভরদ্বাজ ঋষির শ্রীমুখ থেকে উক্ত হয়েছিল। বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চমব্রাহ্মণের উনবিংশতিতম মন্ত্রে দধ্যঙ্ ঋষি ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশের জন্য বলেছেন–

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপংপ্রতিক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরুপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ।।[17]

আচার্য সায়ন তাঁর ভাষ্যে মায়াভিঃ পদের অর্থ করেছিলেন ইন্দ্রদেবতার বিশেষশক্তি। আচার্য শঙ্কর বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষ্যে 'মায়াভিঃ' পদের অর্থ করেছেন 'মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ, নামরূপভূতকৃত–মিথ্যাভিমানৈর্বা, ন তু পরমার্থতঃ, পুরুরূপ ঈয়তে গম্যতে এক এব প্রজ্ঞানঘনঃ সন্ অবিদ্যাপ্রজ্ঞাভিঃ।'[18] কথাটির সরলার্থ, ইন্দ্র বা ব্রহ্ম মায়া দ্বারা প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা, অথবা নাম ও রূপাত্মক উপাধিজনিত মিথ্যা অভিমানরাশি দ্বারা পুরুরূপে অর্থা বহুরূপে প্রতীত হন। বাস্তবিক কিন্তু তিনি প্রজ্ঞানঘনরূপ একমাত্র রূপ। তথাপি তাঁর অবিদ্যাপ্রসূত বিবিধ ভেদজ্ঞানের কারণে নানাপ্রকারে প্রকাশ পান। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, ইন্দ্র বা পরমব্রহ্মের এই রূপবৈচিত্রের কারণ কি? প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে, শত শত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসক্ত থাকে বলে পরমব্রহ্মেরপ্রজ্ঞানঘন রূপ গোচরীভূত হয় না। সুতরাং মায়াশব্দের যে অর্থ উপনিষদের ঋষির অভীষ্ট, সেই অর্থই আচার্য শঙ্কর গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্নোপনিষদ্

অথর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদেরপ্রথমপ্রশ্নখণ্ডের একটি মন্ত্রে মায়া পদটি উক্ত হয়েছে:

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ।
ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ, ইতি।।[19]

মন্ত্রটির সরলার্থ হল ব্রহ্মলোকগমনের অধিকারী হন অকুটিল, মিথ্যাহীন ও মায়াপ্রভাব মুক্ত জীব। আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে মায়া পদের অর্থ করেছেন– 'তথা মায়া গৃহস্থানামিব ন যেষু বিদ্যতে। মায়া নাম বহিরন্যথাত্মানং প্রকাশ্যান্যথৈব কার্যং করোতি সা মায়া মিথ্যাচাররূপা।'[20] আচার্য শঙ্করের অভিমত হল, গৃহস্থদের ব্যবহারিক জীবন নির্বাহ করার জন্য নানাবিধ বক্রতা, মিথ্যা ও মায়া বা অন্তর এবং বাইরের মধ্যে ব্যবধান ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ একজন গৃহস্থ সর্বদা বহির্জগতে নিজেকে যেভাবে প্রকট করে অন্তর্জগতে বা মানসিকভাবে সে আসলে ভিন্নভাব ধারণ করে। কেবলমাত্র ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই আন্তর–বাহির আচরণভিন্নতাই মায়া। অতএব মায়া শব্দের অর্থ এখানে মিথ্যাচার।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে মায়া শব্দটি তিনবার উক্ত হয়েছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেপ্রথমাধ্যায়ের দশমমন্ত্রে উক্ত হয়েছে –

ক্ষরংপ্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাত্ তত্ত্বভাবাত্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তি।।[21]

উক্ত মন্ত্রে মায়ার নিবৃত্তির উপায় উক্ত হয়েছে। মন্ত্রের সরলার্থ হল, প্রধান বা প্রকৃষ্ট ধান বা প্রকৃষ্ট ধারক বিনাশী, আপাতভাবে জীবাত্মা বলা যেতে পারে। তা বিনাশী। অবিদ্যাহারী পরমেশ্বর অমর ও অবিনাশী। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাই প্রধান ও পুরুষকে নিয়ন্ত্রিত করেন। বারংবার একাগ্রচিত্তে তাঁর ধ্যান করলে, অর্থাৎ জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ হলে, এবং আমিই ব্রহ্ম এরূপ তত্ত্বরূপ উপস্থিত হলে, তৎক্ষণাত্ সংসাররূপ মায়ার নিবৃত্তি হয়। অর্থাৎ এখানে বারংবার ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করার প্রয়াস থেকেই প্রারব্ধকর্মের সমাপ্তি হয় এবং আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। আত্মজ্ঞানোদয়ে মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং এই জগৎ আসলে মায়া। তাই জাগতিক সমস্ত কিছুই মায়াময়, আসলে তার বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। এটিই অদ্বৈতবেদান্তসম্মত মায়াতত্ত্বের সার। উপনিষদের ঋষির দ্বারা তা আভাসিত। আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে মায়া পদের অর্থ করেছেন– 'সুখদুঃখমোহাত্মকাশেষপ্রপঞ্চরূপমায়ানিবৃত্তিঃ।'[22]

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে চতুর্থাধ্যায়ের নবমমন্ত্রে উক্ত হয়েছে –

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্ অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।।[23]

উক্ত মন্ত্রের সরলার্থ হল, বেদসমূহ, যূপসম্বন্ধরহিত যজ্ঞসমূহ, সোমরসসংযুক্ত ক্রতুসমূহ, ব্রতসমূহ, ত্রিকাল এবং যা কিছু বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে, সেই সমস্ত এই অক্ষর ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম মায়াশক্তি অবলম্বনে এই জগৎকে সৃজন করেন এবং সেই সৃষ্ট জগতে অবিদ্যা দ্বারা জীবরূপে বদ্ধ হন। এখন প্রশ্ন হয়, অবিকারী ব্রহ্ম থেকে কিভাবে বিকারী জগতের উৎপত্তি সম্ভব? সেই প্রশ্নের উত্তরেই মায়াশব্দের অবতারণা। মায়া হল পরমব্রহ্মের এমন এক শক্তি যার দ্বারা তিনি নিজে জগৎ নির্মাণ করেন, আবার নিজেই নিজের তৈরী করা জগতে মোহিত হয়ে বদ্ধ হন। সুতরাং মায়া অনির্বর্ণনীয় ব্রহ্মশক্তি। যা ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণে পর্যবসিত করে। সুতরাং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ অনুসারে মায়া স্বরূপাচ্ছাদক শক্তি।

আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে মায়াপদের এরূপ শক্তিই স্বীকার করেছেন–
'অবিকারিব্রহ্মণঃ কথং প্রপঞ্চোপাদানত্বং? ইত্যত আহ মায়ীতি। কূটস্থস্যাপি

স্বশক্তিবশাতসর্বস্রষ্টৃত্বমুপপন্নমিত্যেতত্। বিশ্বং পূর্বোক্তপ্রপঞ্চং সৃজত উৎপাদয়তি। স্বমায়য়া কল্পিতে তস্মিন্ ভূতাদিপ্রপঞ্চে মায়য়ৈবান্য ইব সন্নিরুদ্ধঃ সংবদ্ধঃ অবিদ্যাবশগো ভূত্বা সংসারসমুদ্রে ভ্রমতীত্যর্থঃ।'[24]

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে চতুর্থাধ্যায়ের দশমমন্ত্রে উক্ত হয়েছে –

মায়াং তুপ্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
মায়াং তুপ্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।[25]

উক্ত মন্ত্রের সরলার্থ হল, প্রকৃতিকে মায়া বলে এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলে জানবে। সেই মহেশ্বরই অবয়বরূপে কল্পিত সমস্ত বস্তুসমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ। কার্য–কারণ সংঘাত না হওয়ার জন্য আলোচ্য মন্ত্রের অবতারণা। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মায়ার কারণে উপাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এ সিদ্ধান্ত স্বীকারে মায়া সর্বশক্তিময়ী হয়ে যায়। তা অনভিপ্রেত ও অনিষ্ট। তাই এখানে জগকে মায়া ও জগৎস্রষ্টাকে মায়াবী বা মায়াধীশ বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হয়, জগৎ দৃষ্ট হলেও স্রষ্টা অদৃশ্য কেন? তদুত্তরে আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে বলেছেন – '...তস্য প্রকৃতস্য পরমেশ্বরস্য রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানেষু কল্পিতসর্পাদিস্থানীয়ৈঃ মায়িকৈঃ স্বাবয়বৈরধ্যাসদ্বারেদং ...।'[26] অর্থাৎ রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম হয়, তদনুরূপ পরম ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। সুতরাং শ্লোকের অর্থ থেকে একথা বলা যায় যে, এখানে মায়াশব্দের বস্তুস্বরূপভ্রম অর্থ বাচ্য।

অর্বাচীনকালীন উপনিষদ্

মুখ্য উপনিষদ্–গুলি ছাড়াও গৌণ বা অর্বাচীনকালীন উপনিষদ্–গুলিতে মায়াশব্দের উল্লেখপ্রাচুর্য সুলভদৃষ্ট হয়। নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে, চুলিকোপনিষদে, রামপূর্বতাপনীয়োপনিষদে, গোপীচন্দ্রোপনিষদে, কৃষ্ণোপনিষদে, কৈবল্যোপনিষদে, মৈত্রী–উপনিষদে এবং সর্বোপনিষদসার গ্রন্থে মায়াশব্দের একাধিকবার ব্যবহার হয়েছে। এই সমস্ত উল্লেখে মায়া শব্দের অর্থ ভ্রান্তি এবং উপস্থিতি বা আবির্ভাব।

মাণ্ডূক্যকারিকায় মায়াশব্দের প্রয়োগ

অদ্বৈতবেদান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল মান্ডূক্যোপনিষদ, তাকে কেন্দ্র করে গৌড়পাদ বিরচিত মান্ডূক্যকারিকা। এই মাণ্ডূক্যকারিকার চারটি প্রকরণ – আগম, বৈতথ্য, অদ্বৈত ও অলাতশান্তি। প্রত্যেকটিপ্রক্রিয়াকেই এক একটি পৃথক উপনিষদ রূপে গণ্য করা যায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকরণটি মায়া বিষয়ে আলোচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মায়াশব্দে ভ্রান্তি বা আবির্ভাব বা উপস্থিতি অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই গ্রন্থের কোথাও একে অতিপ্রাকৃত শক্তি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মান্ডূক্যকারিকার মধ্যে

ষোলটি পংক্তিতে মায়া শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ছয়টি পংক্তিতে এবং চতুর্থ অধ্যায় চারটি পংক্তিতে মায়া শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি করে পংক্তিতে মায়া শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

মায়াশব্দের অর্থবিবর্তন

সংক্ষেপে, আমরা দেখেছি যে মায়া শব্দটি ঋগ্বেদে যে যে অর্থে উল্লিখিত হয়েছে –

১. অতিপ্রাকৃতশক্তি, রহস্যময় ইচ্ছাশক্তি, আশ্চর্য দক্ষতা এবং অন্তর্নিহিত রহস্যের ধারণা, যার উপর পরবর্তীকালে আরও জোর দেওয়া হয়েছিল, যার পরিণতি অথর্ববেদে দেখা যায়।

২. ইন্দ্রজাল ও বিভ্রম অর্থেও ঋগ্বেদে মায়া শব্দটির ব্যবহার হয়েছে এবং আরও আমরা দেখেছি যে ব্রাহ্মণসাহিত্যে এবং উপনিষদে ভ্রমার্থেই এর ব্যবহারবাহুল্য।

৩. বিভ্রান্তি রূপ অর্থ, এই অর্থটিই পরবর্তীকালে আরও স্থির হয়, এবং আচার্য শঙ্করের সময়ে তা নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিভ্রম অর্থটি সহজেই শব্দটির বৈদিক ব্যবহারের মধ্যে থেকে পাওয়া যেতে পারে। ঋগ্বেদে যেখানে এর অর্থ শক্তি বা দক্ষতা, অর্থাৎ সেখানে সর্বদা এর অর্থ অতিপ্রাকৃত বা বিস্ময়কর শক্তি এবং সাধারণ শারীরিক শক্তি নয়।

রহস্য বা আশ্চর্যের ধারণা সর্বদা উপস্থিত ছিল, এবং এটিই মূল উপাদান, যা পরবর্তীকালে মায়া শব্দটির বিকাশিত আকারে যে বিভ্রম অর্থ তার সাথে সংযুক্ত। ঋগ্বেদের অতিপ্রাকৃত শক্তির পুরানো অর্থটি অথর্ববেদে যাদুবিদ্যার ধারণার এবং আধুনিককালের বিভ্রম অর্থটির মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি করেছিল। যেমনটি ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। মায়াকে মূলত দুটি দিক থেকে দেখা হয়েছে –

১. মায়া হল সৃষ্টির নীতি, মায়া হল কারণ যা বিস্ময়কর শক্তির সাথে অর্থগতভাবে সংযুক্ত।

২. মায়া নিজেই একটি পার্থিব বা অসাধারণ সৃষ্টি এটি একটি কার্যস্বরূপ, যা বিভ্রমের বা দৃশ্যের অর্থের সাথে সংযুক্ত।

উপসংহার

বৈদিকসাহিত্যে উক্ত মায়াশব্দটির একটি সংক্ষিপ্ত অর্থগত জরিপের পরে এখন মায়াবাদতত্ত্বের কিঞ্চিৎ মূল্যায়ণ করণীয়। শব্দটির অর্থ এবং তত্ত্ব বা ধারণা এক নয়, অথবা এক, তাই নিয়ে অনেকের বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ থাকে। এই জাতীয় বিভ্রান্তিই

ভারতীয় চিন্তায় মায়ার মতবাদসম্পর্কিত বিভিন্ন মিথ্যা অনুমানের জনক। যারা মনে করেন, মায়া এই মতবাদটির উৎস এবং বিকাশ অর্বাচীন, এটি আসলে পরবর্তীকালীন আদর্শবাদী ধারণা বা জ্ঞাতার চিন্তার উপর নির্ভর করে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুসরণকারী বৈদান্তিকদের পরামর্শ তাঁদের উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, বিষয়টির এই সহজ সরলীকরণ না করাই শ্রেয়ঃ। যাঁরা মায়াতত্ত্বকে প্রাচীন বলে দাবী করেন না, তাদের অভিমত হল, মায়ার ধারণাটি ভারতীয়চিন্তারপ্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থসমূহে যেমন উপনিষদ ইত্যাদিতে বিদ্যমান ছিল না। এ বিষয়ে কোনও আলোচনার প্রত্যাশা না করেই আমরা কেবল এটাই বলতে পারি যে, এই জাতীয় সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ প্রামাদিক। অতএব মায়ার ধারণাটি অত্যন্ত প্রাচীন, এমনকি মায়াশব্দের থেকেও প্রাচীন। শব্দটি তত্ত্বার্থে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রথমবার উক্ত হয়েছিল, তবে তত্ত্ব বা ধারণাটি বৈদিক সভ্যতার শেষপর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। বিবক্ষু প্রবন্ধকারের অভীষ্ট সিদ্ধান্ত হল, যদিও মায়াবাদের তত্ত্বটি একেবারে প্রতিষ্ঠিত নিয়মের আকারে নয, কিন্তু অগোছালোভাবে ঋগ্বেদে এবং উপনিষদ্সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। মায়াবাদের বৈদিকসাহিত্যে অস্তিত্বের সপক্ষেইপ্রবন্ধের যুক্তিসমূহ সুবিন্যস্ত।

তথ্যসূত্র:

1. J. L. Joshi, *Dhātupātha* (Delhi: Motilal Banarssidas, 1984), p.24.
2. Joshi, *Dhātupātha*, p.26.
3. Joshi, *Dhātupātha*, p.29.
4. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, প্রভাটীকাসহিত, সম্পা. দেবেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ন (কোলকাতা: সদেশ, ২০০৩), পৃ: ১৪১।
5. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, পৃ: ৪৯৯।
6. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, পৃ: ১৯৭ ।
7. *Ṛgveda-Samhitā*, with the commentary of Sayanacharya, vol.II, ed. N.S. Sontakke and others (Poona: Tilak Maharashtra University, Vaidik Samsodhana Mandala, 1936), p. 293.
8. Prabhu Dutt Shastri, *The Doctrine of Maya in the Philosophy of the Vedanta* (New Delhi: Isha Books, 2013), p.29.
9. Prabhu Dutt Shastri, *The Doctrine of Maya in the Philosophy of the Vedanta*, pp. 30.
10. Yaska, *Nirukta (Part-I)*, ed. trans. into Bengali Amareswara Thakur (Kolkata: University of Calcutta, 2003), p.170.
11. Yaska, *Nirukta (Part-I)*, p.172.

12. Yaska, *Nirukta (Part-I)*, p.737.
13. Yaska, *Nirukta (Part-I)*, p. 930.
14. Yaska, *Nirukta (Part-I)*, p.1298.
15. Yaska, *Nirukta (Part-I)*, p.1298.
16. Patanjali, *Vyākaranamahābhāsyam*, Prathama-adhyāya, ed.Harinarayan Tiwari, (Varanasi: Chowkhamba Vidyabhavan, 2009), p.512.
17. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, সম্পা. ও অনু. দুর্গাচরণ সাংখ্য–বেদান্ততীর্থ (কোলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড,২০০০), পৃ: ৬৯৩।
18. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, সম্পা. ও অনু. দুর্গাচরণ সাংখ্য–বেদান্ততীর্থ পৃ: ৬৯৪।
19. *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)*, সম্পা. ও অনু. স্বামী গম্ভীরানন্দ (কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৮), পৃ: ১৪৩।
20. *Praśnopaniṣad with Śāṇkara commentary*, (Gorakhpur: Gita Press,1992). pp. 22.
21. *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)*, সম্পা. ও অনু. স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ৩৬৯।
22. *Śvetāśvataropaniṣad with Śāṇkara commentary*, (Gorakhpur: Gita Press,1995). p.106.
23. *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)*, সম্পা. ও অনু. স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ৪০২।
24. *Śvetāśvataropaniṣad with Śāṇkara commentary*, (Gorakhpur: Gita Press,1995). pp.194.
25. *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)*, সম্পা. ও অনু. স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ৪০৩।
27. *Śvetāśvataropaniṣad with Śāṇkara commentary*, p.196.